প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল

আজ আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন ! সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স আজ আমাকে ডক্টর উপাধি দান করে আমার গত পাঁচ বছরের পরিশ্রম সার্থক করল । এক ফলের বীজের সঙ্গে আর এক ফলের বীজ মিশিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর, সুগন্ধ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর নতুন ফল যে তৈরি হতে পারে, এটা আমার এই রিসার্চের আগে কেউ জানত না । গতবছর সুইডেনের বৈজ্ঞানিক স্‌ভেন্ডসেন আমার গিরিডির ল্যাবরেটরিতে এসে আমার ফলের নমুনা দেখে এবং চোখ একেবারে থ । দেশে ফিরে গিয়ে কাগজে লেখালেখির ফলে আমার এই আবিষ্কারের কথা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে ! আমার আজকের এই সম্মানের জন্য স্‌ভেন্ডসেন অনেকখানি দায়ী ! তাই এখন ডায়রি লিখতে বসে তাঁর প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে !

সুইডেনে আগে আসিনি । এসে ভালই লাগছে । সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ । এটা মে মাস—তাই চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য দেখছি । কিন্তু সে সূর্য কেমন ঘোলাটে, নিস্তেজ । সবসময়ই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে আছে । শীতকালে যখন রাত্রি ফুরোতে চায় না তখন না জানি লোকের মনের অবস্থা কেমন হয় । শুনেছি ছ মাস রাত্রির পর প্রথম সূর্যের আলো দেখে এখানের লোক নাকি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যা করে । আমরা যারা বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকি, তারা বোধ হয় ভালই আছি । বেশি উত্তরে ঠাণ্ডা দেশে যারা থাকে তাদের হিংসে করার কোনও কারণ নেই ।

এখানের কাজ সেরে নরওয়েতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল । এর অবিশ্যি একটা কারণ আছে ! বছর চারেক আগে যখন ইংলন্ডে যাই তখন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ প্রোফেসর আর্চিবল্ড অ্যাক্‌রয়েডের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় । সাসেক্সে তাঁর কটেজে একটা উইক এন্ডও কাটিয়ে এসেছিলাম । অ্যাক্‌রয়েডও তখন নরওয়ে যাব যাব করছেন, কারণ সেখানে নাকি 'লেমিং' বলে ইঁদুর জাতীয় এক অদ্ভুত জানোয়ার বাস করে—সেইটে তিনি স্টাডি করবেন । লেমিং এক আশ্চর্য প্রাণী । বছরের কোনও একটা সময় এরা কাতারে কাতারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে । পথে শেয়াল, নেকড়ে, ঈগল পাখি ইত্যাদির আক্রমণ অগ্রাহ্য করে খেতের ফসল নিঃশেষ করে, সব শেষে সমুদ্রে পৌঁছে সেই সমুদ্রের জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে !

দুঃখের বিষয় অ্যাক্‌রয়েডের স্টাডি বোধ হয় অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল, কারণ গিরিডি থাকতেই কাগজে পড়েছিলাম, নরওয়ে ভ্রমণের সময় তাঁর মৃত্যু হয় । অ্যাক্‌রয়েডের পক্ষে যেটা সম্ভব হয়নি, আমার দ্বারা সেটা হয় কি না দেখব বলেই নরওয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম ।

রাত্রে ডিনারের পর হোটেলে ফেরার কিছু পরে আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, তখনও আমার মাথায় লেমিং-এর চিন্তাই ঘুরছিল । দরজা খুলে দেখি একটি মাঝবয়সি লম্বা ভদ্রলোক, মাথায় সোনালি চুল, চোখে সোনার চশমা, আর সেই চশমার পুরু কাচের পিছনে এক জোড়া তীক্ষ্ণ নীল চোখ । ভদ্রলোক ঠোঁট ফাঁক করে অল্প হেসে যখন তাঁর পরিচয় দিলেন তখন লক্ষ করলাম তাঁর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো । তাঁর কথায় জানলাম তাঁর

বাস নরওয়ের সুলিটেল্‌মা শহরে। নাম গ্রেগর লিন্ডকুইস্ট। লোকটি নাকি শিল্পী, বিখ্যাত লোকদের প্রতিকৃতি তৈরি করেন ঠিক পুতুলের মতো করে। অর্থাৎ গায়ের রং, চুল, নখ, পোশাকটোশাক সব আসল মানুষের মতোই, কেবল সাইজ ছ ইঞ্চির বেশি নয়।

একথা সেকথার পর একটু বিনয়ী, কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন 'আপনি যদি আমার ওখানে দিনকতক আতিথ্য গ্রহণ করেন তা হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব, সেই অবসরে আপনার একটি পুতুল-প্রতিকৃতি গড়ে নিতে পারব।' লিন্ডকুইস্ট আরও বললেন যে তাঁর কালেকশনে নাকি কোনও বিখ্যাত ভারতীয়ের পুতুল-মূর্তি নেই, এবং আমি এই প্রস্তাবে রাজি হলে নাকি তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

কথায় কথায় আমার লেমিং সম্পর্কে জানবার আগ্রহটাও প্রকাশ পেয়ে গেল। তাতে ভদ্রলোক বললেন, লেমিং-এর সন্ধানে বনবাদাড়ে ঘোরার আগে তিনি তাঁর বাড়িতেই নাকি একটি লেমিং সংগ্রহ করে আমাকে দেখাতে পারবেন। এর পরে আর আমার কিছু বলার রইল না।

আগামী বৃহস্পতিবার ভদ্রলোকের সঙ্গেই নরওয়ে যাত্রা করব স্থির করেছি।

১৭ই মে

দু' দিন হল সুলিটেল্‌মা শহরে এসেছি। নরওয়ের উত্তরপ্রান্তে কিয়োলেন উপত্যকায় এ শহরটি ভারী মনোরম। আশেপাশে তামার খনি রয়েছে, আর শহরের পশ্চিমদিকে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলিটেল্‌মা পর্বতশৃঙ্গ। ৬৩৩০ ফিটের মতো হাইট, কাজেই আমাদের হিমালয়ের এক একটি শৃঙ্গের কাছে একে সামান্য টিলা বলে মনে হবে। কিন্তু নরওয়েতে এই শৃঙ্গ উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে পরম যত্নে রেখেছেন। এঁর বাড়ির আশেপাশে আর কোনও বাড়িটাড়ি চোখে পড়ে না। এমনিই নরওয়ে দেশটায় লোকসংখ্যা কম, তার মধ্যেও লিন্ডকুইস্ট যেন একটি জনবিরল পরিবেশ বেছেই নিয়েছে। আমার এতে কোনও আপত্তি নেই। আমাদের গিরিডির বাড়িটাও নিরিবিলি জায়গা বেছেই তৈরি করেছিলাম আমি।

লেমিং এখনও দেখা হয়নি। দু'-এক দিন সময় চেয়ে নিয়েছে লিন্ডকুইস্ট। এতেও আপত্তি নেই—কারণ আমি হাতে কিছুটা সময় নিয়েই দেশ ছেড়েছি। আপাতত বিশ্রামের প্রয়োজন। ট্রাউট মাছ খাচ্ছি আর খুব ভাল cheese খাচ্ছি। সব মিলিয়ে বেশ আরামে আছি।

তবে লিন্ডকুইস্টের একটা বাতিক মাঝে মাঝে কেমন যেন অসোয়াস্তির সৃষ্টি করে। সে আমার দিকে প্রায়ই একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কথা বলার সময় চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যখন দু'জনে চুপচাপ বসে থাকি, তখনও মাঝে মাঝে অনুভব করি যে সে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আজ সকালে এর কারণটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। লিন্ডকুইস্ট বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, কোনও লোকের পোর্ট্রেট করার আগে কিছুদিন যদি ভাল করে তাকে দেখা যায়, তা হলে মূর্তি গড়ার সময় শিল্পীর কাজ সহজ হয়ে যায় এবং যার পোর্ট্রেট হচ্ছে তাকেও আর একটানা বেশিক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে হয় না।

আমার আরেকটা প্রশ্ন আরও চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'আপনার পুতুলগুলি কবে দেখাবেন? বড় কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু।'

লিন্ডকুইস্ট বলল, 'পুতুলগুলোয় ধুলো পড়েছে। আমার চাকর হান্‌স সেগুলো পরিষ্কার

করলে পর কাল সন্ধ্যা নাগাদ সেগুলো দেখাতে পারব বলে আশা করছি।'

'আর লেমিং ?'

'আগে পুতুল—তারপর লেমিং। কেমন ?'

অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম।

১৮ মে রাত ১২টা

দু' ঘণ্টা হল ঘরে ফিরেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই আজকের ঘটনা পরিষ্কার করে লিখতে রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছে।

আজ সন্ধ্যা সাতটায় (সন্ধ্যা বলছি ঘড়ির টাইম অনুযায়ী কারণ এখানে সত্যিকারের রাতদিনের কোনও তফাত বোঝা যায় না) লিন্ডকুইস্ট তার বৈঠকখানায় একটা গোপন দরজা খুলে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমাকে মাটির নীচে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলগুলো দেখাল। আমি এ রকম আশ্চর্য জিনিস আর কখনও দেখিনি।

টেবিলের উপর রাখা কাচের আবরণে ঢাকা যে জিনিসগুলি দেখলাম সেগুলিকে পুতুল বলতে বেশ দ্বিধা বোধ করছি। আসল মানুষের সঙ্গে এদের তফাত কেবল এই যে এগুলো নিষ্প্রাণ। এবং এদের কোনওটাই ছ ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে আসল মানুষের যা আয়তন, এগুলি তার দশভাগের এক ভাগ।

সব সুদ্ধ ছ'টি পুতুল রয়েছে। সবই নামকরা লোকের, যদিও এদের সকলের চেহারার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। যাদের দেখে চিনলাম, তাদের মধ্যে রয়েছে—ফরাসি ভূপর্যটক আঁরি ক্লেমো, আর নিগ্রো চ্যাম্পিয়ন বক্সার বব স্লিম্যান।

আর ছ' নম্বর কাচের খাঁচায় যে পুতুলটি কালো চশমা পরে ডান হাত কোটের পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হলেন পরলোকগত ব্রিটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ ও আমার বন্ধু আর্চিবল্ড অ্যাক্‌রয়েড—ছ' বছর আগে লেমিং-এর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে নরওয়েতেই যাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাক্‌রয়েডের পুতুল দেখেই বুঝতে পারলাম পোট্রেট হিসেবে এগুলো কী আশ্চর্যরকম নিখুঁত। শুধু যে মোটামুটি তাঁর চেহারা মিলেছে তা নয়—এগুলো এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যাতে নাকি মাথার চুল, গায়ের চামড়া, চোখের তারা, সবই একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়।

এই শেষ পুতুলটি দেখে তো নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। অ্যাক্‌রয়েডের সামনে আমাকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লিন্ডকুইস্ট জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ? একে চেনো নাকি ?'

বললাম, 'বিলক্ষণ। ইংলন্ডে আলাপ হয়েছিল—প্রায় বন্ধুত্বই। লেমিং-এর খবর ওঁর কাছেই পাই। নরওয়েতেই তো ওঁর মৃত্যু হয় বলে শুনেছিলাম।'

'তা হয়। তবে আমার ভাগ্যটা খুবই ভাল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই আমার এখানে এসেছিলেন, আর তখনই এই পুতুলটি তৈরি করে ফেলি। যাদের পুতুল দেখছ তাদের সকলেই আমার বাড়িতে থেকে আমাকে সিটিং দিয়ে গেছে।'

গুপ্ত ঘরটা থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় লিন্ডকুইস্ট বলল, 'পরশু থেকে তোমার পোর্ট্রেটের কাজ শুরু করব।'

আমি ঘরে বসে বসে ডায়রি লিখছি, আর অ্যাক্‌রয়েডের সেই হাসি হাসি মুখটা আমার মনে পড়ছে। কোনও মানুষের পক্ষে যে এমন পুতুল তৈরি করা সম্ভব হতে পারে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। লিন্ডকুইস্ট লোকটা কি শুধুই শিল্পী—না বৈজ্ঞানিকও বটে ? কী উপাদান দিয়ে ও পুতুলগুলি গড়ে, যাতে চোখ, নখ, চামড়া, চুল এত আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক

বলে মনে হয়। আশা করি আমার মূর্তিটি ও আমার সামনেই গড়বে, যাতে মালমশলা নিজের চোখে দেখার সুযোগ হবে।

কাল সকালে বরং ওকে এ বিষয় দু-একটা প্রশ্ন করে দেখব, দেখি না কী বলে।

আপাতত লেমিং-এর প্রশ্নটা স্থগিত রেখে পুতুল নিয়েই পড়া যাক।

১৯শে মে

কাল রাত্রে একটি ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে একটা তীব্র উগ্র গন্ধ নাকে আসতে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। গন্ধটা অনেকক্ষণ ছিল। কিছু পরিচিত এবং কিছু অপরিচিত জিনিস মেশানো একটা নতুন গন্ধ। চেনার মধ্যে কপার সালফেট ও ফেরাস অক্সাইড। এ ছাড়া কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ সেটা কেমিক্যালও হতে পারে বা অন্য কিছুও হতে পারে। মোটকথা এই বাড়িতে কিংবা বাড়ির আশেপাশে কোথাও কেমিক্যাল নিয়ে কারবার চলেছে। লিন্ডকুইস্ট যে বৈজ্ঞানিকও সে সন্দেহটা আরও দৃঢ় হল।

সকালে বুড়ো চাকর হান্‌স এসে বলল, 'বাবু একটু বেরিয়েছেন ; আপনাকে অপেক্ষা না করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতে বলেছেন !'

খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ির ভিতরে এবং আশপাশটায় একটু পায়চারি করে দেখলাম। এখানে সেখানে ঝোপঝাড়ের পিছনে ফ্লাস্ক, টেস্টটিউবের টুকরো এবং একটা মরচেধরা বুনসেন বার্নার দেখে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না। পুতুলগুলোর পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারসাজি রয়েছে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

একটা খটকা কেবল মনে খোঁচা দিচ্ছে। যে বৈজ্ঞানিক, সে আর একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দেবে কেন ?

সাড়ে ন'টা নাগাদ যখন ঘরে ফিরছি তখনও লিন্ডকুইস্টের দেখা নেই। হান্‌স-কে জিজ্ঞেস করাতে সে তার ফেরার টাইম কিছু বলতে পারল না। একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে মাথায় একটা বদ্‌বুদ্ধি এল। দিনের বেলা পুতুলগুলোকে আর একবার দেখে আসতে পারলে কেমন হয় ?

গুপ্ত ঘরের দরজাটা খোলার একটা সংকেত আছে। দরজার হাতলটা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তারপর সেটাকে একটা টান দিলেই সেটা খুলে যায়। গতকাল লিন্ডকুইস্ট হাতলটা নিয়ে কবার ডানদিকে কবার বামদিকে ঘুরিয়ে তারপর টানটা দিয়েছিল সেটা আমি মনে মনে মুখস্থ করে রেখেছিলাম। সাধারণ লোকের পক্ষে অবিশ্যি এ কাজটা সম্ভব হত না।

হান্‌স-কে ডেকে বললাম, 'আমার একটা জরুরি টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার। তুমি যদি কাজটা করে দিতে পার—আমার ঠাণ্ডা দেশে এসে একটু হাঁপ ধরেছে—এতটা পথ হাঁটতে ভরসা পাচ্ছি না।'

হান্‌স অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল, এবং আমিও আমার বাড়ির চাকর প্রহ্লাদের নামে একটা আজগুবি টেলিগ্রাম লিখে হান্‌সকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

হান্‌স রওনা হবার পর আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আমি বাড়ির গেটের বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক চাইলে বহুদূর অবধি দেখা যায়। লিন্ডকুইস্টের কোনও চিহ্ন দেখলাম না—বুঝলাম সে ফিরলেও মিনিট পনেরোর আগে নয়।

ভেতরে ফিরে এসে গুপ্ত দরজায় গিয়ে মুখস্থমাফিক হাতলটা এদিক ওদিক ঘোরানো শুরু করলাম। যথাসময়ে একটা খচ্ শব্দে দরজাটা খুলে গেল। পকেটে টর্চ ছিল। সেটা জ্বেলে

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম !

গুপ্ত ঘরে পৌঁছে একটা করে কাচের খাঁচাগুলোর উপর আলো ফেলে দেখতে শুরু করলাম। কালকের চেয়ে কোনও বিশেষ তফাত চোখে পড়ল না। এক নম্বরে সেই ইটালিয় গায়ক—নাম বোধ হয় মারিয়ো বাতিস্তা, দুই-এ মুষ্টিযোদ্ধা বব স্লিম্যান, তিন-এ ফরাসি পর্যটক আঁরি ক্লেমো, চার-এ জাপানি সাঁতারু হাকিমোতো, পাঁচে সেই জার্মান কবি, নাম মনে নেই, আর ছ'য়ে আমার বন্ধু অ্যাক্‌রয়েড।

আমি টর্চটা নিয়ে অ্যাক্‌রয়েডের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। খাঁচাগুলি বেশ। এরকম জিনিস এর আগে দেখিনি কখনও। একরকম কাচের আবরণ থাকে—মন্দিরের চুড়োর মতো, যাতে অনেক সময় ভাল ঘড়ি কিংবা মূর্তি ঢাকা দেওয়া থাকে। এ কতকটা সেই রকম কিন্তু তফাত এই যে এতে আবার একটা দরজা আছে। এবং তাতে কবজা এবং চাবি লাগানোর বন্দোবস্ত আছে। অবিশ্যি ইচ্ছা করলে পুরো ঢাকনাটাই হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

আমি কাচের সঙ্গে প্রায় মুখ লাগিয়ে দিয়ে অ্যাক্‌রয়েডের পুতুলটা দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হল গতকালের ভঙ্গির সঙ্গে যেন সামান্য একটু তফাত। কালকে যেন ডান হাতটা পকেটের মধ্যে আর একটু বেশি ঢোকানো মনে হয়েছিল। তাই কি ?—না আমার চোখের ভুল ? এমনও তো হতে পারে যে পুতুলগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ানোর ব্যবস্থা করা আছে। লিন্ডকুইস্ট হয়তো মাঝে মাঝে দরজা খুলে তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটু বদল করে দেয়। কিংবা হয়তো পুতুলগুলোকে ঝাড়পোঁছ করার সময় হাত পা একটু নড়ে যায়। একবার খুলে পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয় ?

কিন্তু অ্যাক্‌রয়েডের পুতুলটায় হাত দিতে কেমন জানি সংকোচ বোধ হল, তাই জাপানি সাঁতারুর পুতুলের ঢাকনাটা খুলে সেটা আস্তে হাতে তুলে নিলাম। নিয়েই বুঝলাম যে হাত পা নাড়ানোর কোনও উপায় লিন্ডকুইস্ট রাখেনি। পুতুলগুলো একেবারেই অসাড় এবং অনড়।

কাচের ঢাকনা চাপা দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গুপ্ত দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

লিন্ডকুইস্ট ফিরল সাড়ে বারোটার সময়। দুপুরে খাবার টেবিলে তাকে বললাম, 'আজ একটু পড়াশুনো করবার ইচ্ছে হচ্ছে। তোমাদের এখানেও শুনেছি বেশ ভাল একটা পাবলিক লাইব্রেরি আছে। একবার যাওয়া যায় কি ?'

লিন্ডকুইস্ট বলল, 'স্বচ্ছন্দে। আমি রাস্তা বাতলে দেব। আজই যাও—কারণ কাল থেকে তো তোমায় সিটিং দিতে হবে।'

আমি বিশ্রাম না করেই বেরিয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে কেমন জানি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ উঁকি মারছিল, সেই কারণেই কিছু পুরনো খবরের কাগজ ঘাঁটার দরকার হয়ে পড়েছিল।

সাড়ে তিন ঘণ্টা লাইব্রেরিতে বসে 'লন্ডন টাইম্‌স' কাগজের ফাইল ঘেঁটে মনে গভীর সন্দেহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দু বছর আগের ১১ই সেপ্টেম্বরের টাইম্‌স কাগজে আর্চিবল্ড অ্যাক্‌রয়েডের মৃত্যুসংবাদ পড়ে জানতে পারলাম যে অ্যাক্‌রয়েড কীভাবে কোথায় মারা গিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। নরওয়ে ভ্রমণকালে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল ফিয়োর্ড পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে একটি নৌকোয় চাপতে। সেই নৌকোটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি—কাজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নৌকোডুবির ফলেই অ্যাক্‌রয়েডের মৃত্যু ঘটে।

বব স্লিম্যান, হাকিমোতো ও আঁরি ক্লেমোর মৃত্যুসংবাদও পড়লাম। এঁরা সকলেই ইউরোপে নিখোঁজ হয়েছেন, এবং সকলকেই অনেক অনুসন্ধানের পর মৃত বলেই ধরে নেওয়া

priyobanglaboiblogspot.com

হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এসে বাকিটা দিন যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবেই কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। লেমিং সম্পর্কে কৌতূহলটা মন থেকে প্রায় মুছে গেছে।

রাত্রে খেতে বসে লিন্ডকুইস্ট বলল, 'শঙ্কু তুমি মদ খাও না ? আমাদের দেশের একটা ভাল ওয়াইন একটু চেখে দেখবে নাকি ? আমার অবশ্য এই বিশেষ মদটা রোচে না তবে লোকে খুব ভাল বলে। একটু দেখো না খেয়ে।'

পাছে লিন্ডকুইস্টের মনে আমার সন্দেহ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ জাগে তাই আপত্তি করলাম না।

লিন্ডকুইস্ট খানিকটা মদ গ্লাসে ঢেলে দিল। গেলাসটা ঠোঁটের কাছে আনতেই কেমন জানি একটা সন্দেহজনক গন্ধ পেলাম। তাও সামান্য খানিকটা চুমুক দিয়ে সেটাকে ন্যাপকিনে ফেলে দিয়ে বললাম, 'এ ব্যাপারে তোমার ও আমার রুচি একই রকম। তার চেয়ে বরং তুমি যেটা পান করছ সেটাই কিছুটা আমাকে দাও না।'

লিন্ডকুইস্ট মদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছিল, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে অভিসন্ধিটা আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে।

আজ রাতটা যে করে হোক জেগে থেকে ও কী করে সেটা দেখতে হবে।

২০শে মে

কাল রাত্রে না ঘুমোনোর ফলে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল সেটা আজ সকালেই লিখে ফেলেছি—

লিন্ডকুইস্টের এই কাঠের বাড়িতে দরজার চৌকাঠ বলে কিছু নেই। ফলে হয় কী পাশের ঘরে আলো জ্বালালে দরজা বন্ধ থাকলেও তার তলার ফাঁক দিয়ে সে আলো দেখা যায়। লিন্ডকুইস্টের বৈঠকখানায় কুকু ক্লক-এর কোকিল তখন সবে বারোটার ডাক ডেকেছে। আমি আমার সেই ঘুম-তাড়ানি ট্যাবলেটটা না খেয়েও তখন দিব্যি জেগে বসে আছি—কারণ মনে কেমন জানি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে রাত্রে একটা কিছু ঘটবে। এমন সময় আমার বন্ধ দরজার তলা দিয়ে আলো দেখলাম। কে জানি বৈঠকখানায় আলো জ্বেলেছে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ ! তারপরেই একটা পরিচিত 'খুচ' শব্দ শুনতে পেলাম।

এবার বৈঠকখানার বাতিটা নিবে গেল।

আমি মিনিটখানেক চুপ করে থেকে মোজা পায়ে আস্তে আস্তে আমার দরজার দিকে এগিয়ে সেটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে চোখ লাগিয়ে ওদিকে দেখে নিলাম ! তারপর দরজা খুলে এগিয়ে গেলাম। গুপ্ত দরজার দিকে গিয়ে দেখি দরজা খোলা।

বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তখন একটা অদম্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। সাড়ে তিন পাক নামলে পরে পুতুলের ঘরে পৌঁছানো যায়। তিন পাকের শুরুতেই একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এল।

আমার কান—শুধু কান কেন আমার সব ইন্দ্রিয়ই—সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ ; তবুও এ শব্দটা এতই নতুন, এটা চিনতে আমার বেশ কিছুটা সময় লাগল। অবশেষে হঠাৎ চিনতে পেরে বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল।

এ হল মানুষের চিৎকার ! কিন্তু গলার স্বরটা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক গুণে তীক্ষ্ণ ও মিহি। চিৎকারের ভাষাটা জাপানি।

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ওই জাপানি পুতুল সাঁতারু হাকিমোতোই কোনও বিপন্ন অবস্থায় পড়ে এ ভাবে আর্তনাদ করছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে চিৎকারটা শুনছি, এমন সময় হঠাৎ সেটা থেমে গেল। তারপর টং করে কাচের শব্দ। এ শব্দেরও কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। কাচের খাঁচার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ এটা।

আমার কৌতূহল এখন সব ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। আমি সিঁড়ির বাকি ধাপ কটা নেমে গিয়ে দেয়ালের পাশ দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম।

লিন্ডকুইস্ট একটা চাবি দিয়ে সেই ফরাসি পর্যটকের খাঁচাটা খুলেছে। তারপর হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে পুতুলটাকে বাইরে বের করে এনে তার গায়ে বাঁ হাত দিয়ে কী যেন একটা ঠেকাতেই পুতুলটা হাত পা ছুড়তে আরম্ভ করল—এবং তারপর শুরু হল ক্ষীণ মিহি সুরে আর্তনাদ। লিন্ডকুইস্টের ব্যবহারে কোনও বিচলিত হবার লক্ষণ দেখলাম না। সে আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে একটা ছোট্ট ড্রপার দিয়ে পুতুলের হাঁ করা মুখে কী যেন পুরে দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে পুতুলের হাত পা ছোড়া থেমে গেল। তারপর লিন্ডকুইস্ট আগের সেই প্রথম জিনিসটা পুতুলের গায়ে ঠেকাতেই সেটার হাত পা অসাড় হয়ে আগের অবস্থায় চলে এল। লিন্ডকুইস্ট সেটাকে খাঁচার মধ্যে পুরে দাঁড় করিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল। আমি আমার জায়গায় বিহ্বল অথচ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পিছনেই দশ হাতের মধ্যেই যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা লিন্ডকুইস্টের খেয়ালই হল না।

এরপরে অ্যাক্‌রয়েডের পালা।

উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের হাতের মুঠোয় অ্যাক্‌রয়েডের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার ক্রোধ ও উত্তেজনা সংবরণ করা কঠিন হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম অ্যাক্‌রয়েডের ছট্‌ফটানি থেমে গেল। এত দূর থেকেও মনে হল তার মাথাটা যেন আমারই দিকে ঘোরানো তারপর পরিষ্কার মার্জিত ইংরেজি উচ্চারণে অতি কষ্টে মিহি চিৎকার এল—'শঙ্কু, তুমি কী করছ এখানে—পালাও পালাও!'

পুতুলের মুখে আমার নাম শোনামাত্র লিন্ডকুইস্ট বিদ্যুদ্বেগে সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই আমিও ঘুরে তিন চার সিঁড়ি একসঙ্গে উঠে বৈঠকখানা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য—লিন্ডকুইস্ট আর আমার ঘরের দিকে এল না।

এখন সকাল ৯টা। ব্রেকফাস্টের জন্য আমার ডাক পড়েনি। এটাও বুঝতে পেরেছি যে—আর ডাক পড়বে না। আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২৩শে মে

কালকের ঘটনার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল। এখনও লিন্ডকুইস্টের দেখা নেই। আমার ঘরে কিছু ফল রাখা ছিল, আর আমার সঙ্গে কিছু বিস্কুট ছিল—এ ছাড়া কাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। খিদের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটা অবসাদও এসে পড়ছে। কাল রাত্রে সব বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। তার মধ্যে একটাতে দেখলাম ইঁদুরের মতো দেখতে একটা অতিকায় জানোয়ার আমার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। তারপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ আর একটা বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। আমি কিছুক্ষণ অবশ হয়ে পড়ে রইলাম। তখন থেকেই ঘরে একটা গন্ধ পাচ্ছি; এখন বুঝতে পারছি সেটা আসছে আমার ফায়ার প্লেসের ভিতর থেকে। চিমনি দিয়ে গন্ধটা ঘরে ঢুকছে।

শুধু গন্ধ নয়। গন্ধের সঙ্গে বাষ্পের মতো কী যেন ঢুকে ঘরটাকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আমার মাথাটাও কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। লিখতেও বেশ অসুবিধে হচ্ছে। আর বোধ হয় কলম—

৭ই জুন

আমি সুস্থ আছি বলব না তবে বেঁচে যে আছি এটাই বা কী কম আশ্চর্যের কথা? স্কান্ডিনেভিয়ান এয়ারওয়েজের ভারতগামী প্লেনে বসে ডায়রি লিখছি। ডিনারে ট্রাউট মাছ দিয়েছিল—খাইনি, লিন্ডকুইস্টের বাড়িতে খাওয়া কোনও কিছুই আর কোনওদিন খেতে পারব কি না জানি না। সুলিটেল্‌মার পুরো ঘটনাটা মন থেকে চিরকালের জন্য মুছে ফেলার কোনও বৈজ্ঞানিক উপায় আছে কি না সেটা গিরিডিতে গিয়ে ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক আপাতত ঘটনাটা আমার এই ডায়রিতে লিখে রাখি কারণ এ ধরনের পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার একটা বিবরণ দেওয়া থাকলে আর কিছু না হোক, ভবিষ্যতে একটা ওয়ার্নিং-এর কাজ করতে পারে।

আমার ২৩শে মে-র বিবরণে ধোঁয়া আর গন্ধের কথা বলেছিলাম। গন্ধটা কখন যে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল সেটা আমি টেরই পাইনি। জ্ঞান যখন হল তখন মনে হল আমি একটা বিশাল ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। ঘরের ছাতটা এতই উঁচুতে যে আমি যেন ভাল করে দেখতেই পাচ্ছি না। প্রথমে মনে হল আমি হয়তো কোনও গির্জার ভিতরে রয়েছি। কিন্তু তারপর ভাল করে দেখতে ছাতের কড়ি-বরগাগুলো চোখে পড়ল, আর সেগুলো যেন কেমন চেনা মনে হল।

যে জিনিসটার উপর শুয়ে আছি সেটা পিঠের তলায় কেমন নরম নরম মনে হচ্ছিল। তবে সেটা বিছানা নয়, কারণ সেটা স্থির থাকছিল না।

তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেলে আমার মাথাটা একটু ডান দিকে ঘোরাতেই একটা তীব্র আলোয় আমার চোখটা প্রায় ঝলসে গেল। সেই আলোটাও যেন অস্থির, মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়ছে, মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। একবার আলোটা সরে গিয়ে আমার চোখটা কিছুক্ষণ রেস্ট পাওয়াতে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম!

আলোটা আসছিল দুটো বিরাট গোল কাচ থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে। কাচের পিছনে জ্বল জ্বল করছে দুটো মসৃণ নীল চক্র—তার মাঝখানে আবার অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি কালো চক্র। এই কালো বিন্দু সমেত নীল চক্র দুটিও স্থির নয়—এদিক ওদিক নড়ছে, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে। হ্যাঁ—চাইছেই বটে—কারণ ও দুটো আসলে চোখ। লিন্ডকুইস্টের চোখ। কাচ দুটো লিন্ডকুইস্টের সোনার চশমা। আমি শুয়ে আছি লিন্ডকুইস্টের দস্তানা পরা হাতের উপর। আর আমি আয়তনে হয়ে গেছি অন্য পুতুলগুলোরই মতো। অর্থাৎ, যা ছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু সাইজে ছোট হয়ে গেলেও, আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি কমেনি। কেবল বাঁ হাতের কাঁধের কাছটায় একটা যন্ত্রণা। বুঝলাম সেখানে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে।

লিন্ডকুইস্ট এবার আমার উপর ঝুঁকে পড়ল। তার গরম নিশ্বাস আমার শরীরের উপর অনুভব করলাম। এইবার তার ঠোঁটটা ফাঁক হতেই সোনার দাঁতটা ঝলমল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধ, আরও উত্তপ্ত হাওয়া, লিন্ডকুইস্টের কথা—

'আমার 'হবি'-টা কেমন বলো তো, শঙ্কু? বেশ নতুন ধরনের—নয় কি? লোকে ডাকটিকিট জমায়, দেশলাইয়ের লেবেল জমায়, পুরনো টাকা জমায়, অটোগ্রাফের খাতায়

লোকের সই জমায়—আর আমি বাছাই করে দেশ বিদেশের বিখ্যাত লোকদের ধরে ধরে তাদের পুতুল করে কাচের ঢাকনা ঢেকে রেখে দিই। আমার এই অদ্ভুত শখ, এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্য কি কেউ উপাধি দেবে ? কেউ না !...তুমি বলবে, একজন বৈজ্ঞানিক তো আমার সংগ্রহে রয়েছে, তা হলে আর তোমাকে রাখা কেন। আসলে কী জান। বৈজ্ঞানিক বলে তোমাকে রাখছি না ; রাখছি ভারতীয় বলে। বিখ্যাত ভারতীয় আর চট করে ঘরের কাছে কোথায় পাব বলো? নরওয়েতে আর কজনই বা আসবে ? আর আমার এই আস্তানায় তো সকলে সব সময়ে আসতেই চায় না—যেমন তুমি এলে ?'

লিন্ডকুইস্ট দম নেবার জন্য একটু থামল। তারপর জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'আমার সবচেয়ে বড় গুণ' কী জান ? আমি খুন করি না। এরা আসলে জ্যান্ত রয়েছে। দিনের বেলায় ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে এদের অসাড় করে রেখে দিই। রাত বারোটায় আবার শক্ দিয়ে জাগিয়ে ড্রপার দিয়ে খাইয়ে দিই। প্রয়োজন হলে তখন এদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলি। তবু আফশোষ এই যে এরা এত নির্ভাবনায় থেকেও কেউই খুশি থাকতে পারছে না। জ্ঞান হলেই সব কটাই 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে উদ্ধার করো' ইত্যাদি বলে চেঁচাতে থাকে ! যেখানে খাওয়া পরার কোনও চিন্তা করতে হচ্ছে না, জীবনধারণের কোনও সমস্যার প্রশ্নই যেখানে উঠছে না, সেখানে পালাবার এত ইচ্ছের কারণটাই আমি বুঝতে পারছি না। তোমায় দেখে মনে হয় তুমি বেশ সহজেই পোষ মানবে—তাই নয় শঙ্কু ?'

লিন্ডকুইস্ট তার কথা শেষ করে আমাকে তার হাত থেকে নামিয়ে টেবিলের উপর শোয়াল। তারপর আমার কোমরে এবং বুকের ওপর এক জোড়া স্ট্র্যাপ আটকে বন্দি করে ফেলল।

আমি আপত্তি বা গায়ের জোর দেখানোর কোনও চেষ্টাই করলাম না—কারণ আমি জানতাম যে তাতে কোনও ফলই হবে না। এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখা, এবং আমার এই খুদে অবস্থায় কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কী ভাবে লিন্ডকুইস্টকে সায়েস্তা করা যায় সেইটে ভেবে স্থির করা।

লিন্ডকুইস্ট বলেছে যে খুদে মানুষকে অসাড় পুতুলে পরিণত করতে হলে ইলেকট্রিকের শক্ দিতে হয়। আমাকে কিন্তু ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে লিন্ডকুইস্ট বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না, কারণ আমার গেঞ্জির নীচে আমার সেই কার্বোথিনের পাতলা জামাটা রয়েছে। সেবার গিরিডিতে ঝড়ের মধ্যে আমার বাগানে গাছের চারাগুলো বাঁচাতে গিয়ে কাছাকাছি একটা তালগাছে বাজ পড়ায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই এই জামাটা আবিষ্কার করি এবং ২৪ ঘণ্টা পরে থাকি।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে শোয়ানো অবস্থায় রেখে ঘরের অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এবারে দেখলাম ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। তারপর একটা কাঠের টেবিল টানার শব্দ পেলাম। তারপর কাচের ঠুংঠাং আওয়াজ ! তারপর একটা সুইচ জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার গায়ের উপর একটা তীব্র আলো এসে পড়ল। তারপর দেখলাম লিন্ডকুইস্টের চশমার ঝলসানি। লিন্ডকুইস্ট আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এবার তার দৈত্যের মতো হাতটা নেমে এল আমার দিকে, তাতে একটা ইলেকট্রিকের তার লক্ষ করলাম। লিন্ডকুইস্টের ঠোঁটের কোণে একটা বিশ্রী হাসি।

এবার তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে আবার সোনার দাঁতটা দেখা গেল আর চাপা কর্কশ স্বরে কথা এল, 'এসো বাছাধন, আমার সাত নম্বরের পুতুল ! এসো—'

ইলেকট্রিকের তার সমেত লিন্ডকুইস্টের ডান হাতটা আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন করে ফেলল। আমার স্নায়ুর ভিতর একটা সামান্য শিহরনে বুঝতে পারলাম যে লিন্ডকুইস্ট

তারটা আমার গায়ে ঠেকিয়েছে। প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সে তারটাকে এইভাবে ঠেকিয়ে রেখে তারপর সেটাকে সরিয়ে নিল।

আমি মটকা মেরে মড়ার মতো পড়ে রইলাম।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। লিন্ডকুইস্ট আমার স্ট্র্যাপগুলো আলগা করে দিয়ে আমাকে হাতে তুলে নিল। আমি হাতপাগুলোকে টান করে রইলাম—যেন পুতুল হয়ে গেছি।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে একটা নতুন টেবিলের উপর নতুন কাচের খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচার দরজায় চাবি দিয়ে গেল। ঘরের বাতি নিভে গেল। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভারী পায়ে উঠে যাওয়ার শব্দ পেলাম। গুপ্ত দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

এবার আমি হাত পা আলগা করলাম।

ঘরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। আমি হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই কাচের দেয়ালের সামনে পড়লাম। হাত দিয়ে ঠেলে দেখি সেটা রীতিমতো ভারী ; এক চুলও নড়ানো সম্ভব নয়। কাচের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে ভাবতে আরম্ভ করলাম। নরউইজিয় বুনো শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কাচের ঢাকনা আর টেবিলের মাঝখানে সামান্য যে ফাঁক রয়েছে সেইখান দিয়েই এই শব্দ আসছে, এবং এই চুল পরিমাণ ফাঁক দিয়েই যে হাওয়া ঢুকছে সেটাই আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট।

ওপরে বৈঠকখানা থেকে কুকু ক্লকের শব্দ শুনলাম—কুক্কু ! কুক্কু ! কুক্কু !

তিনটে বাজল। রাত না দিন তা বোঝার কোনও উপায় নেই। আধো আধো ঘুমের আমেজ অনুভব করলাম। পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে গাটাকে এলিয়ে নিলাম। নিজের অবস্থার কথা ভাবতে হাসি পেল। আমি ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু—সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স কর্তৃক সম্মানিত বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক—আজ একজন নরউইজিয় পাগলের হাতে পুতুল অবস্থায় বন্দি। গিরিডির কথা মনে পড়ছে—উশ্রী নদী, খাড়ুলি পাহাড়, আমার বাড়ি, আমার বেড়াল নিউটন, চাকর প্রহ্লাদ, আমার ল্যাবরেটরি। আমার বাগানের উত্তর দিকে সেই গোলঞ্চ গাছ, আমার কত অসমাপ্ত কাজ, কত গবেষণা, কত—

টুং টুং টুং !

ওটা কীসের শব্দ ? একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে আসতে গিয়ে থেমে গেল। আমি পা দুটোকে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

টুং টুং—টুং টুং টুং—টুং টুং !

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার পাশের খাঁচা থেকে শব্দটা আসছে। অ্যাক্রয়েডের খাঁচা।

টুং টুং—টুং টুং টুং—টুং টুং !

এ কী ! এ যে মর্স কোড—টেলিগ্রাফের টরেটক্কার ভাষা ! আর এ ভাষা যে আমিও জানি !

আমিও কাচের গায়ে হাত ঠুকে জানালাম—'আবার বলো।'

আবার টুং টুং শব্দ হল। আমি মনে মনে তার মানে করতে লাগলাম। অ্যাক্রয়েড বলল, 'আমারও কার্বোথিনের পোশাক। আমি পুতুল সেজে আছি। তুমি যেদিন এলে—দেখে আনন্দ হল, ভয় হল, প্রকাশ করিনি।'

আমিও টুং টুং করলাম—'দ্বিতীয় দিন ? যখন একা ছিলাম ?'

'একা এসেছিলে ? দেখিনি। বোধ হয় ঘুমিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে ঘুমোনো অভ্যাস করেছি। সেদিন রাত্রে আর থাকতে পারলাম না—চেঁচাতে বাধ্য হলাম।'

'কদিন আছ এখানে ?'

'দু বছর। আমার মৃত্যুর সময় থেকেই। অনেক দেখেছি দু বছরে অনেক জেনেছি, অনেক ভেবেছি। এবার বোধ হয় পালাবার সুযোগ এসেছে।'

'মানুষ হয়ে ? না, পুতুল ?'

'মানুষ ! ওষুধ আছে। কাল রাত্রে খাবার সময় প্রস্তুত থেকো। আজ ক্লান্ত। হাত অবশ। ঘুমোব। গুড নাইট।'

আমি ধীরে ধীরে কাচে টোকা মেরে গুড নাইট জানিয়ে দিলাম। অ্যাক্‌রয়েড বেঁচে আছে—আমারই মতো। কার্বোথিনের ফরমুলা আমিই ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু পালানোর কী উপায় ও আবিষ্কার করেছে ? জানি না। আবার মানুষ হয়ে গিরিডিতে ফিরতে পারব ? অক্ষত দেহে ? জানি না। কপালে কী আছে কিছুই জানি না।

ভাবতে ভাবতে আমারও কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙার পরেও বাকি সময়টা অন্ধকারেই কাচে ঠেস দিয়ে বসে কাটিয়েছি। কুকু ক্লকটা অনেকবার বেজেছে। প্রথমে সময়ের খেয়াল রেখেছিলাম, তারপর আর রাখিনি। অবশেষে এক সময় রাত বারোটা যে বাজল সেটা গুপ্ত দরজা খোলার শব্দ থেকেই বুঝলাম। শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সোজা হয়ে পুতুলের ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ালাম।

লিন্ডকুইস্ট ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। একটা গুনগুন শব্দ শুনে বুঝলাম সে গান গাইছে। তারপর খুট শব্দ করে ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠল। আমি মাথা না ঘুরিয়ে আড় চোখে যতদূর দেখা যায় তাই দেখার চেষ্টা করলাম।

লিন্ডকুইস্ট কিন্তু আমাদের টেবিলের দিকে এল না। সে ঘরের পিছনের দিকে আরেকটা দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেল এবং সেখানেও একটা বাতি জ্বলে উঠল। আমি আবার আরেকটু সাহস করে অ্যাক্‌রয়েডের দিকে চাইলাম।

অ্যাক্‌রয়েড আমায় দেখে একটু হাসল ! তারপর ডান পকেটে ঢোকানো হাতটা আস্তে আস্তে বার করল। তারপর হাতটা আমার দিকে তুলে ধরল। দেখি তার হাতে একটা ছোট্ট আধ ইঞ্চি লম্বা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ।

অ্যাক্‌রয়েডের এর পরের কাজ আরও বিস্ময়কর। সে সিরিঞ্জটা পকেটে পুরে তার খাঁচার দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চাবির গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে দরজাটা খুলে গেল। অ্যাক্‌রয়েড দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আমার তো দম বন্ধ হবার জোগাড়। লিন্ডকুইস্ট যদি ফিরে আসে ? অ্যাক্‌রয়েড যেন সে বিষয়ে কোনও চিন্তা না করেই টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে খাঁচার পিছন দিকটায় এসে এদিকে সেদিক দেখে টেবিল থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা আত্মহত্যা করছে নাকি ? না তা নয়। একটা ইলেকট্রিকের তার টেবিলের পিছন দিয়ে গিয়ে মাটিতে ঠেকেছে—অ্যাক্‌রয়েড টেবিলের থেকে অব্যর্থ লক্ষ্য করেই ঝাঁপটা দিয়েছে এবং তারটা ধরে সে মেঝের দিকে নামছে। অ্যাক্‌রয়েড যে বেশ সুস্থ সবল লোক ছিল সেটা আমি জানতাম—কিন্তু এই দুরূহ জিমনাস্টিকের কাজটাও যে তার আয়ত্তে থাকতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না !

তার বেয়ে মাটিতে নেমে অ্যাক্‌রয়েড খোলা দরজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে অন্য ঘরটায় চলে গেল। ঘরটা থেকে যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসছে সেটা আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এবার শুনতে পেলাম ! এটা তো মানুষের গলার শব্দ নয় ! তবে এটা কী ? আমার পক্ষে এ শব্দ চেনা অসম্ভব।

শব্দটা বন্ধ হবার পর লিন্ডকুইস্টের পায়ের আওয়াজ পেলাম। সে বাতি নিভিয়ে আমাদের ঘরটায় ফিরে এল। দরজাটার সামনেই এক নম্বর খাঁচা। লিন্ডকুইস্ট চাবি বার করে খাঁচার দরজা খুলে ইতালীয় গায়ক বাতিস্তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি কাঠের

মতো দাঁড়িয়ে আড়চোখে একবার লিন্ডকুইস্টের দিকে, একবার পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চাইতে লাগলাম।

যথারীতি বাতিস্তার চিৎকার হল। অ্যাক্রয়েড পাশের ঘরে কী করছে না করছে ভেবে ঠাহর করতে চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছফুট লম্বা দেহ নিয়ে ঝড়ের মতো প্রবেশ করে আমার বন্ধু অ্যাক্রয়েড লম্ফ দিয়ে এগিয়ে এসে লিন্ডকুইস্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি খাঁচার মধ্যে বন্দি, তার উপর দৈর্ঘ্যে মাত্র ছ' ইঞ্চি—অ্যাক্রয়েডকে যে সাহায্য করব তার কোনও উপায় নেই!

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলাম যে অ্যাক্রয়েডের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। লিন্ডকুইস্টের সাধের এক নম্বরের পুতুল হাতে থাকাতে প্রথমত সেইটিকে পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতেই অ্যাক্রয়েড তাকে জাপটে ধরে ফেলল।

লিন্ডকুইস্ট কিছু করতে পারার আগেই দেখি অ্যাক্রয়েড একটা সিরিঞ্জ নিয়ে নরউইজিয়ের বাঁ হাতের কোটের আস্তিনের উপর দিয়েছে প্রচণ্ড খোঁচা।

তারপর? তারপরের দৃশ্য আরও ভয়াবহ, আরও অবিস্মরণীয়। কয়েক মুহূর্ত আগেই অ্যাক্রয়েডকে দেখেছিলাম তারই সমান একটি জোয়ান লোককে জাপটে ধরতে—আর এখন দেখলাম অ্যাক্রয়েডের বাঁ হাতের মুঠোয় লিন্ডকুইস্টের ছ ইঞ্চি লম্বা একটি পুতুলের সংস্করণ!

অ্যাক্রয়েড অবজ্ঞাভরে পুতুলটিকে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে তার গায়ে বৈদ্যুতিক তারটা ঠেকিয়ে সেটাকে অসাড় করে দিল।

তারপর আমার খাঁচার দিকে এসে কাচের ঢাকনা তুলে ফেলে তার পকেট থেকে সেই ছোট্ট আধ ইঞ্চি সিরিঞ্জটা বার করে আমায় দিয়ে বলল, 'এত ছোট জিনিসটা তুমিই ভাল করে হ্যান্ডল করতে পারবে। এটা নিয়ে ফেলো।'

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ইঞ্জেকশনটা নিয়ে নিজের আয়তনে ফিরে এলাম। কিন্তু এই ওষুধ অ্যাক্রয়েড পেল কী করে?

প্রশ্ন করতে অ্যাক্রয়েড আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সুইচ টিপতেই ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

ঘরের মাঝখানে প্রায় ছাত অবধি উঁচু একটা বিরাট কাচের খাঁচা। পাশের ঘরের পুতুলের খাঁচার মতোই দেখতে কিন্তু ভিতরে বিখ্যাত মানুষের বদলে রয়েছে একটি অতিকায় ইঁদুর জাতীয় জানোয়ার।

আমি পরম বিস্ময়ে অসাড় জন্তুটির দিক থেকে অ্যাক্রয়েডের দিকে চাইতেই সে বলল—'বোধ হয় অনুমান করতে পারছ জানোয়ারটা কী? এটা লেমিংএর একটা অতিকায় সংস্করণ; আসল লেমিং-এর চেয়ে দশগুণে ছোট। কিছুদিন থেকেই লিন্ডকুইস্ট এই নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে—বড় জিনিসের ছোট সংস্করণের মতো ছোট জিনিসের বড় সংস্করণ জমিয়ে রাখার শখ হয়েছিল বোধ হয়। সফল যে হয়েছে সেটা কালকেই জানতে পেরেছিলাম হান্স-এর সঙ্গে লিন্ডকুইস্টের কথাবার্তা থেকে। এবং ওই ওষুধই যে আমাদের আসল চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারবে, এটা তখনই আন্দাজ করেছিলাম।'

আমি অন্যান্য পুতুলগুলো দেখিয়ে বললাম—'এদের কী হবে?'

অ্যাক্রয়েড মাথা নেড়ে বলল, 'এদের তো আর কার্বোথিনের জামা ছিল না, তাই এরা মানুষ অবস্থায় আর বাঁচতে পারবে না। এদের মৃত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। চলো, যাওয়া যাক।'

আমরা ঘোরানো সিঁড়ির দিকে রওনা দিলাম। অ্যাক্রয়েডকে গম্ভীর দেখে কেমন জানি

সন্দেহ লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি দেশে ফিরে যাবে ?'

অ্যাক্‌রয়েড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার স্মৃতিসভা হয়ে গেছে তা জান ? আমার স্ত্রী বিধবার পোশাক পরেছে। আমার নামে আমার টাকা থেকে একটা স্কলারশিপ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়া একটু বেখাপ্পা হবে না কি ?'

'তা হলে তুমি কী করবে ?'

'একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। লেমিংদের সঙ্গে এখনও ভাল পরিচয় হয়নি। আর কয়েকদিন পরেই ওদের সমুদ্রযাত্রা শুরু হবে। আমিও সেই দলে ভিড়ে পড়ব ভাবছি। একটা সামান্য প্রাণী যদি নির্ভয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তো আমি পারব না কেন ?'

১২ই জুন

গিরিডিতে ফেরার চার ঘণ্টা পর এ ডায়রি লিখছি। একটা কথা লেখা দরকার—কারণ সেটা এর আগের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ফিরে আসার পর থেকেই লক্ষ করছিলাম আমার চাকর প্রহ্লাদ আমার দিকে বারবার কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে। এখন তার কারণটা বুঝতে পেরেছি। আমার যে জুতোটা গিরিডিতে রেখে গিয়েছিলাম সেটা পরতে গিয়ে দেখি পায়ে ছোট হচ্ছে। তারপর কালো কোটটা পরতে গিয়ে দেখি আস্তিনটা সামান্য ছোট। তখন আমার হাইটটা মাপতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

লিন্ডকুইস্টের ওষুধ আমাকে ঠিক আগের আয়তনে ফিরিয়ে না এনে আমাকে আগের চেয়ে দু' ইঞ্চি লম্বা করে দিয়েছে।

সন্দেশ। ফাল্গুন ১৩৭১

প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক-রহস্য

৭ই এপ্রিল

অবিনাশবাবু আজ সকালে এসেছিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'ব্যাপার কী ? শরীর খারাপ নাকি ? সকালবেলা এইভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না !'

আমি বললুম, 'এর আগে কখনও এইভাবে বসে থাকিনি তাই দেখেননি।'

'কিন্তু কারণটা কী ?'

'একটা নতুন যন্ত্র নিয়ে প্রায় দেড় বছর একটানা কাজ করে কাল সকালে সেটার কাজ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। তাই ঠিক করেছি সাত দিন বিশ্রাম নেব।'

অবিনাশবাবু একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাকে পই পই করে

priyobanglaboi.blogspot.com